Vol. 34 | No. 3 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বেণীসংহার নাটকের রস-বিচার

Volume	34
Issue	3
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফয়েজুন্নেছা বেগম
Published online	June 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i3.7
Pages	121-132
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বেণীসংহার নাটকের রস-বিচার

ফয়েজুন্নেছা বেগম

ভারতীয় সাহিত্যমীমাংসায় রসকেই কাব্যের সার বলা হয়েছে। কাব্য শ্রব্যই হোক আর দৃশ্যই হোক, দর্শক-পাঠককে তার অনেক কিছু দেবার থাকলেও রসাস্বাদ-জনিত পরম আনন্দইতার মূল দেয়। ভারতীয়-নন্দনতত্ত্বে দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটক-প্রকরণাদি অবলম্বন করেই এই রসবাদের উদ্ভব, ভরতমুনি যার আদি প্রবক্তা এবং তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* যার মূল গ্রন্থ। ভরত নামে কোন ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন কিনা তা বলা যায় না। তাঁর নামে যে গ্রন্থখানি প্রচলিত, সেই *নাট্যশাস্ত্র* যে অধুনালভ্য ভারতীয় কাব্য-বিচারসম্পর্কিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম, তাতে কোন দ্বিমত নেই। নাট্যক সম্পর্কে লেখক, পরিচালক এবং দর্শক-শ্রোতা, সবার দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনাত্মক *নাট্যশাস্ত্র*-র মত গ্রন্থ পৃথিবীর আর কোন ভাষায় আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে বলে জানা যায়নি। এই *নাট্যশাস্ত্রে* সর্বপ্রকার কাব্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে — রসহীন রচনা নিরর্থক, আর বস্তু বা ইতিবৃত্ত হল কাব্যের বা নাট্যের শরীর।[১] অভিনব গুপ্ত দ্বিতীয় বাক্যটির ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ইতিবৃত্ত অর্থাৎ রূপকের বস্তু হল শরীর এবং রস আত্মা।[২]

নাট্যশাস্ত্র-র ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত বাক্যটির পরই রসের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে — *বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ* অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। বাক্যটি ছোট, কিন্তু এর ব্যাখ্যা নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক কালে বিভিন্ন ভাষায় এত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে যে তাকে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যের মর্যাদাই দেওয়া যায়। জানিনা ভরতমুনির মনে এত কথা ছিল কি না। তবে *নাট্যশাস্ত্র*-র ঐ রসের স্বরূপটি এবং রস কত প্রকার এবং তাদের

স্বভাব কি — এ সব নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। আমি সাধারণ্যে প্রচলিত মতটি ধরে ভট্টনারায়ণ-লিখিত *বেণীসংহার* নাটক-এর রস আলোচনা করব।

নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনায় যে রসবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, তার কতকগুলি মূল সিদ্ধান্ত আছে। প্রথমেই সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। রস আস্বাদ-স্বরূপ, এই আস্বাদ গ্রহণে তাঁরাই সমর্থ যাঁদের উপযুক্ত মানসিক গঠন আছে। তাঁদের বলা হয় সহৃদয়। তাঁরাই সহৃদয় যাঁদের কাব্যাদি অনুশীলন ও পরিচিন্তনের ফলে মন হয়েছে নির্মল এবং যাঁরা কাব্য-নাটকবর্ণিত ভাবে তন্ময় হবার যোগ্যতা রাখেন,— স্বল্প কথায় অনেকের মনের ভাবের সঙ্গে নিজের ভাব মিলিয়ে একাত্মতা অনুভব করতে পারেন। কথাটা বলেছেন *ধ্বন্যালোক*-এর লোচন টীকায় আচার্য অভিনব গুপ্ত।[৩] কিন্তু রস কি পদার্থ? এর উত্তর সরাসরি দেওয়া যায় না। একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন। মানুষের চিত্তলোক গঠিত কতকগুলি বৃত্তি দ্বারা। এই চিত্তবৃত্তির মাঝে আটটি (কোনও মতে নয়টি) প্রধান, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে স্থায়ী-ভাব। কাব্য-পাঠে বা নাট্য-দর্শনে সহৃদয়ের এই আটটি স্থায়ীভাবের যে কোন একটি যদি এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে যে তখন তিনি কাব্য-নাটক বর্ণিত ভাবে তন্ময় হয়ে যান এবং নিজের অন্তরের অপূর্ব আনন্দে মগ্ন হয়ে পড়েন — তখনকার অবস্থাকেই বলা হয় রসাস্বাদ। ভাবই পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলে লাভ করে রসরূপতা। রস তাই বাইরের কোন অপার্থিব কিছু নয়, আমাদেরই একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা। আমাদের চিত্তে ঐ আটটি স্থায়ীভাব ছাড়া আরও অনেক ভাব আছে। ভরত তাদের একটা মোটামুটি সংখ্যা ধরেছেন তেত্রিশ এবং নাম দিয়েছেন ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব। এগুলি রসোদ্বোধের অর্থাৎ রসোল্লাসের সহায়ক। তাছাড়া আছে স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি আটটি সাত্ত্বিকভাব। রসোদ্বোধের মানসিক উপাদান-কারণ চাই মানব-চিত্তবৃত্তি এবং বাহ্যিক কারণ কাব্য-নাট্য জগৎ থেকে প্রাপ্ত। রসের সংখ্যা, বিশেষ করে নাট্যের ক্ষেত্রে আট। ভরত বলেছেন:

> শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ
> বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।

উক্ত আটটি রসের আটটি স্থায়ীভাব হল যথাক্রমে :

> রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
> জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।[৪]

মানবমনের রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়,জুগুপ্সা, এবং বিস্ময় — এই আটটি স্থায়ীভাব উপযুক্ত কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে যথাক্রমে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত এই আটটি রসরূপতা লাভ করে। অবশ্য স্থায়ীভাবের মাত্র যে কোনও একটি এক-ক্ষণে রসরূপতা লাভ করে, অন্য দু-একটির উপস্থিতি যদিও থাকে তাদের ভূমিকা তখন নির্বেদ, গ্লানি ব্যভিচারী ভাবের মত গৌণ হয়ে পড়ে। শম বা নির্বেদ যার স্থায়ীভাব সেই শান্ত রসের স্বীকৃতিলাভ পরবর্তীকালে ঘটেছে বলে পণ্ডিতগণের ধারণা। রস প্রসঙ্গে আরও দুটি পারিভাষিক শব্দ এসে যায়। তার একটি হল আলম্বন এবং উদ্দীপন ভেদে দুই প্রকার বিভাব ও অনুভাব। যাদের যাকে অবলম্বন করে দর্শক-পাঠক চিত্তে ঘটে রসবোধ　　কাব্য-নাটকবর্ণিত সেই নায়ক-নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতিকে বলা হয় আলম্বন বিভাব। *বেণীসংহার* নাটকে যেমন দুঃশাসনের প্রতি ভীমের ভীষণ ক্রোধের ফলে ঘটেছে রৌদ্র রসের পরিবেশ এবং অভিনয়কালে দর্শকচিত্তও এই রসে উদ্বুদ্ধ হয়। আর স্থান-কাল, বেশভূষা হল উদ্দীপন বিভাব। যেমন উক্ত ক্ষেত্রে স্থান রণক্ষেত্র, কাল মধ্যাহ্ন। অনুভাব বিশেষ ভাবের প্রকাশ, নাট্যে বাচিক, আঙ্গিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়ের মাধ্যমে এবং কাব্যে উপযুক্ত বর্ণনার মাধ্যমে ঘটে এই প্রকাশ। অভিনয়-মাধ্যমে বা বর্ণনায় কবির মনোগত ভাব দর্শক-পাঠকের চিত্তে ভাবিত করায় বলেই ভাব এই সংজ্ঞা শব্দটির ব্যবহার। [৫]

উপরের আলোচনার পরিপেক্ষিতে *বেণীসংহার* আলোচনা করা যাক। *নাট্যশাস্ত্র*'র মতে নাটকে থাকবে নৃপতিগণের চরিত-কথা এবং নানা প্রকার রস ও ভাব-ব্যঞ্জক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে সেই কথা।[৬] মূল কথা, নানা প্রকার রস ও ভাবের উদ্রেকে সমর্থ এমন অভিনয়ের সুযোগ থাকতে হবে নাটকে। *বেণীসংহার* নিঃসন্দেহে বীর ও রৌদ্র রস প্রধান। আটটি রসের সবগুলিকে যে থাকতেই হবে নাটকে এমন কোন কঠোর বিধান *নাট্যশাস্ত্রে* নেই। বলা হয়েছে নানা প্রকার রস ও ভাব থাকতে হবে। এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ভাবই পুষ্ট হলে রসতা লাভ করে, অপুষ্ট রস ভাব মাত্র। *নাট্যশাস্ত্রের* মতে নাটকে চারটি বৃত্তি থাকতে হবে।[৭] বৃত্তি চারটি হল ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী। বাকচেষ্টা বা বাচিক অভিনয় ভারতী-বৃত্তির বিষয় এবং নাট্যে সর্বব্যাপী। অন্য বৃত্তির সাথেও ভারতী-বৃত্তি জড়িত। সুক্ষ্ম কায়চেষ্টা যেমন স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি — একে বলা হয় সাত্ত্বিক অভিনয় এবং এর বৃত্তির নাম সাত্ত্বতী। কায়চেষ্টা ললিত-মৃদু এবং উদ্ধত —এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। মোটামুটি শৃঙ্গার রসাত্মক ললিত কায়চেষ্টা কৈশিকী বৃত্তির অন্তর্গত এবং স্থূল কায়চেষ্টা আরভটী বৃত্তির বিষয় বলা হয়। ভারতী বাদ

দিলে *বেণীসংহার নাটকে* সাত্ত্বতী ও আরভটী বৃত্তির প্রাধান্য। অভিনবগুপ্ত কারও কারও মত বলে বলেছেন যে, কারও কারও মতে *বেণীসংহার নাটকে* কেবলমাত্র সাত্ত্বতী ও আরভটী বৃত্তি আছে। অর্থাৎ এই নাটকে কৈশিকী বৃত্তির নিতান্তই অভাব। অভিনবগুপ্ত অবশ্য বলেছেন যে, নাটক ও প্রকরণে সর্ববৃত্তি থাকবে, তার মানে এই নয় যে, কোন এক বৃত্তি না থাকলে নাটকত্বের বা প্রকরণত্বের হানি ঘটবে।[৮] বেণীসংহারে কৈশিকীবৃত্তি না থাকলে শৃঙ্গার রসও থাকতে পারে না। শৃঙ্গারকে রসরাজ আখ্যা দেওয়া যায় সর্বকালের এবং সর্বদেশের সাহিত্যে তার ব্যাপকতা দেখে। সেই শৃঙ্গারের যদি লেশমাত্র না থাকে *বেণীসংহারে*, তাবে সেটা অবশ্যই ত্রুটি। কিন্তু *বেণীসংহারে* ললিত-মৃদু চেষ্টা অর্থাৎ কৈশিকী বৃত্তি একেবারেই নেই একথা স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় অংকে দুর্যোধন-ভানুমতীর দৃশ্যে শৃঙ্গারের স্বল্প প্রকাশ কি কৈশিকী বৃত্তির অন্তর্গত নয়? এই অংকের দারুপর্বত মণ্ডলে শৃঙ্গার একরকম পুষ্টই বলা চলে। সুতরাং শৃঙ্গার রসের ক্ষেত্র স্বল্প হলেও আছে *বেণীসংহারে*, এটা স্বীকার করতে হয়।

শৃঙ্গার রসের অস্তিত্ব *বেণীসংহার*-এর দ্বিতীয় অংকে আছে ঠিকই, কিন্তু কাহিনীর যে পটভূমিকায় আছে সেটা সেখানে যুক্তিযুক্ত কি না — এই প্রশ্নটি তুলেছেন বোধ হয় সর্বপ্রথম অভিনবগুপ্ত। আনন্দবর্ধন রসভঙ্গের নানা আলোচনায় বলেছেন, যে অকাণ্ডে, অর্থাৎ অনুপযুক্ত পরিবেশে কোন রসের প্রকাশও রসভঙ্গের হেতু। এই আলোচনার ব্যাখ্যায় উদাহরণ দিতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত *বেণীসংহার*-এর দ্বিতীয় অংকে দুর্যোধন-ভানুমতীর দৃশ্যের উল্লেখ করেছেন।[৯] তাঁর মতে ইঙ্গিতটা দিয়েছেন স্বয়ং আনন্দবর্ধন। এরই প্রতিধ্বনি আর একটু বিশদভাবে বর্ণিত পাই আমরা *নাট্যদর্পণ*-এ। সেখানেও অকাণ্ডে প্রথনের উদাহরণে বলা হয়েছে— *বেণীসংহারে* ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরদের ক্ষয়কারী যুদ্ধ যখন চলছে তখন ধীরোদ্ধত প্রকৃতির দুর্যোধনের ভানুমতীর প্রতি শৃঙ্গার বর্ণনা।[১০]

কিন্তু এই অভিযোগ ত নাট্যকার নিজেই স্পষ্ট ভাষায় করেছেন কঞ্চুকীর সংলাপে। দ্বিতীয় অংকের আদিতে যে বিষ্কম্ভক সেখানেই কঞ্চুকী ব্রতচারিণী ভানুমতীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন (পৃ. ৩৪) : সাধু পতিব্রতে! সাধু! স্ত্রীস্বভাবেহপি বর্তমানা বরং ভবতী ন পুনর্মহারাজঃ যোহয়মুদ্যতেষু...অদ্যাপ্যন্তঃপুরবিহার সুখমনুভবতি। সহজ কথায় নাট্যকার নিজেই বলেছেন যে, এই শৃঙ্গারের অবতারণা অসময়ে ঘটেছে। তাহলে নাট্যকার কি উদ্দেশ্যে এটা ঘটালেন। তাছাড়া অংশটি *মহাভারতে* নেই, নাট্যকারের স্বকল্পিত। মনে করা যেতে পারে নাট্যকারের কোন

উদ্দেশ্য ছিল। একটা উদ্দেশ্য হতে পারে কৈশিকী বৃত্তির অবকাশ আনা, গোটা নাটকে আর কোথাও যার অবকাশ নেই। নাটককে পূর্ণসন্ধি ও পূর্ণবৃত্তি হতে হবে। এক কথায়, নাট্যতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে ভট্টনারায়ণ এই শৃঙ্গার দৃশ্যটির অবতারণা করেছেন। এটাও ভেবে দেখতে হবে যে, এই দৃশ্যটি না থাকলে গোটা নাটকটাই হয়ে পড়ে যুদ্ধ-বর্ণনা, আস্ফালন, কোলাহল প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। কোন বৈচিত্র্য থাকে না সুতরাং, বৈচিত্র্য আনাও নাট্যকারের উদ্দেশ্য থাকতে পারে। অথবা বলা যেতে পারে যে, নাট্যকার নিজেই দুর্যোধন চরিত্রটিকে হীন করে আঁকার চেষ্টা করেছেন। ব্যাপারটা অন্যদিক থেকেও দেখা যায়। প্রভাতে দুর্যোধনপত্নী ভানুমতীকে আমন্ত্রণ না করেই বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন (পৃ. ৪১)। তাহলে বুঝতে হবে যুদ্ধযাত্রার ত্বরা ছিল দুর্যোধনের। একটু পূর্বেই কঞ্চুকীকে পাঠিয়েছেন যুদ্ধের রথ সাজিয়ে রাখতে এবং বলেছেন যে, ভানুমতীকে আমন্ত্রন-জানিয়েই তিনি আসছেন অর্থাৎ যুদ্ধে যাবেন দুর্যোধন এটা নিশ্চিত (পৃ. ৪০)। যুদ্ধের ফল সব সময়ই অনিশ্চিত। সেই অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে যাবার পূর্বক্ষণে যদি ক্ষণকালের জন্য প্রিয়তমার সঙ্গসুখ লাভের বাসনা জাগে দুর্যোধনের মনে, তাহলে তাকে একটা ভয়ানক অন্যায় মনে করা বোধ হয় যায় না। সেদিক থেকেও বোধ হয় দুর্যোধন ক্ষমার্হ।

সুতরাং সম্পূর্ণ নাটকের দিক থেকে দেখলে দৃশ্যটিকে ঠিক অকান্ডে প্রথন বোধ হয় বলা যায় না এবং নাটক বিচারে তাই দেখা উচিত। নাটকের শরীর জীবদেহের মত। অংশ বিশেষ কেটে নিয়ে বিচার করলে সেটা সুবিচার হয় না। যদি এই 'অকান্ডে প্রথন' দৃশ্যটি না থাকত তাহলে গোটা নাটকখানা যে অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে যেত এটা ঠিক। তাত্ত্বিকেরা যাই বলুন, সাধারণ পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দৃশ্যটিকে কোনক্রমেই অপ্রয়োজনীয় বা দুষ্ট বলা চলে না। অবশ্য অভিনবগুপ্ত একটা দোষের উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন দৃশ্যটিকে, নাটকের দিক থেকে অসঙ্গত বা অপ্রয়োজনীয় বলেন নি। দ্বিতীয় অংকের দারুপর্বত-দৃশ্য নাট্যকার নিঃসন্দেহে টেনে লম্বা করেছেন এবং ঝড় এনে শৃঙ্গারের বিকাশ দেখানোর জন্য একটু বাড়াবাড়ি করেছেন। এর পূর্বেও ভানুমতীর অঞ্জলি দেবার দৃশ্যে পেছন থেকে এসে ফুল দেওয়া এবং তারপর স্পর্শজনিত রোমাঞ্চ প্রভৃতি ধীরললিত নায়কোচিত ব্যবহার ধীরোদ্ধত দুর্যোধনের পক্ষে বেমানান, বিশেষ করে বিপদ-সঙ্কুল সময়ে।

শৃঙ্গারের পরেই আসে হাস্যরসের কথা। হাস্যরসের অভিনয় অবতারণার মূল চরিত্র হিসাবে আমরা নাটক-প্রকরণে প্রায়ই পাই বিদূষককে। শৃঙ্গার-প্রধান

রূপকেই অবশ্য নায়কের সচিব হিসেবে বিদূষককে দেখা যায়। বীর অথবা করুণ রস যেখানে মুখ্য, সেই সকল রূপকে বিদূষক চরিত্রটি সাধারণত অনুপস্থিত। যেমন বীর রসের *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে এবং করুণ রস-প্রধান *উত্তর রামচরিত*-এ কোন বিদূষক নেই। এর মুখ্য কারণটি অন্যভাবে বলে দিয়েছেন স্বয়ং ভরতমুনিই। তাঁর মতে আটটি রসের চারটির উৎপত্তির হেতু অন্য চারটি। এখানে অভিনবগুপ্ত 'উৎপত্তিহেতু' শব্দের অর্থ ধরেছেন 'সূচক'। এ নিয়েও বিতর্ক আছে। তার মাঝে না গিয়ে বলা যায়, *নাট্যশাস্ত্র*'র মতে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর এবং বীভৎস — এই চারটি রস হল যথাক্রমে হাস্য, করুণ, অদ্ভুত এবং ভয়ানক রসের উৎপত্তিহেতু।[১১] সুতরাং শৃঙ্গার-প্রধান রূপকেই হাস্যের অবকাশ অধিক — এইটাই ভরত-মত বলে মেনে নেওয়া যায়। সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যায় যে, অন্য সাতটি রসের সঙ্গে হাস্যের মিল হয় না। *বেণীসংহার* নাটকখানি শৃঙ্গার-প্রধান নয়। সুতরাং এখানে হাস্যের বা বিদূষক-চরিত্রের অবকাশই নেই বলা যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে *বেণীসংহার*-এ এমন কোন দৃশ্য নেই যেখানে হাস্য সামান্যতমও প্রাধান্য পেয়েছে। এটা নাটকের দিক থেকে একটা ত্রুটি বলা যেতে পারে। যাকে আধুনিক আলোচনায় 'ড্রামাটিক রিলিফ' বলা হয় তা *বেণীসংহারে* অনুপস্থিত। এক দ্বিতীয় অংকের অধিকাংশ বাদে, তাও সবটা নয়, অন্য পাঁচটি অংকেই দেখা যায় চরিত্রগুলি ভীষণ মানসিক চাপে পীড়িত, ভবিষ্যতের ভাবনায় অস্থির এবং বিক্ষুব্ধ বর্তমান নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। এ অবস্থায় হাস্যের অবকাশ থাকতে পারে না। হাস্যের অবকাশ ঘটালেই অভিনয়ে ত্রুটি বলে স্বীকার করতে হত হয়ত।

তাহলে *বেণীসংহার* কি হাস্যবর্জিত বলেই ধরতে হবে? এর উত্তর এক কথায় 'হাঁ তাই' বলা চলে। তবে দ্বিতীয় অংকে কঞ্চুকী রথের কেতু-দণ্ড ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ার সংবাদ নিয়ে যেভাবে দুর্যোধন-ভানুমতীর সামনে ছুটে এসেছেন সেখানকার সংলাপ সামান্য হাসির উদ্রেক ঘটাতে পারে। তার প্রধান কারণ বৃদ্ধ কঞ্চুকীর বাচন-ভঙ্গী। তবু মনে করা যেতে পারে যে নাট্যকার হয়ত এখানে একটু হাস্যের উদ্রেকই ঘটাতে চেয়েছিলেন। তারপর তৃতীয় অংকের প্রথমে প্রবেশকে বিকৃতাকার রাক্ষস-মিথুনের প্রথম দিকের অভিনয় সামান্য হাস্যের উদ্রেক ঘটাতে পারে। *নাট্যশাস্ত্রে* বিকৃত আচার, বাক্য, অঙ্গ-বিকার প্রভৃতিকেই হাস্যের জনক বলা হয়েছে।[১২] এইটুকু ছাড়া *বেণীসংহারে* অন্য কোথাও হাস্যের অবকাশ নেই।

নাট্যশাস্ত্র'র মতে বীভৎস রসের সঙ্গে ভয়ানক রসের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। বীভৎস রসের স্থায়ীভাব জুগুপ্সা। সুতরাং ঘৃণ্য কোন বস্তু দেখলে বা স্পর্শ করলে এই ভাবটা জাগে। নাট্যশাস্ত্রকারও বলেছেন — অনভিমত-দর্শন, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও শব্দদোষ

এবং বহুপ্রকার উদ্বেগ দ্বারা বীভৎসরসের উদ্ভব ঘটতে পারে।[১৩] অবশ্য এসব কিছুই যে কাব্য-নাট্য সম্পর্কিত হওয়া চাই সেকথা বলাই বাহুল্য। কারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কোন রসেরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। রস সবসময় কাব্য-নাটক, এক কথায় শিল্প-সম্পৃক্ত। *বেণীসংহার*-এর রাক্ষস-মিথুনের মৃত নরদেহের বসা-শোণিত পান দৃশ্য নিঃসন্দেহে বীভৎস রসের উদ্বোধক। ষষ্ঠ অংকে দুর্যোধনের শোণিতে লিপ্ত সর্বাঙ্গ ভীমের প্রবেশকে বীভৎস বসের উদ্বোধক বলা চলে না। এখানে রৌদ্র-মিশ্রিত বীর রসেরই প্রকাশ।

ভয়ানক রসের উদ্বোধক কারণগুলি হল অট্টহাস্য প্রভৃতি বিকৃত রব শ্রবণ, ভূত-প্রেত জাতীয় কিছু দেখা, যুদ্ধ, ঘোর অরণ্যে বা শূন্য গৃহে গমন এবং গুরুজনের প্রতি অপরাধ ইত্যাদি।[১৪] অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে, ভয় পাওয়াটা স্ত্রীলোক, নীচপাত্র এবং বালক-বালিকার পক্ষেই সম্ভব।[১৫] ভীতিজনক সংগ্রামের বর্ণনা *বেনীসংহারে* অনেক ক্ষেত্রেই আছে। দ্বিতীয় অংকে দুঃস্বপ্ন দেখে ভানুমতীও ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ঐ অংকেই গম্ভীর মেঘগর্জন শুনে ভানুমতী সত্য সত্যই ভয় পেয়ে দুর্যোধনকে জড়িয়ে ধরেছেন। ভীতিজনক অবস্থার বর্ণনা *বেণীসংহারে* অনেক ক্ষেত্রে থাকলেও রস হিসাবে ভয়ানক তেমন পুষ্টিলাভ করেনি কোথাও। বীভৎস রস সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে। অবশ্য কাব্যে ও নাট্যে এই দু'টি রসের প্রাধান্য দেখা যায় না বড় একটা। এগুলি সহায়ক হয়েই থাকে অঙ্গী হয়ে ওঠার অবকাশ পায় না।

করুণরসের স্থায়ীভাব শোক। শোক-দুঃখের যেগুলি লৌকিক কারণ, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু, বিভব-নাশ, ভয়ানক কোন বিপদ-আপদ প্রভৃতি — কাব্য-নাট্যে বর্ণিত সেগুলিই করুণরসের কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে *নাট্যশাস্ত্রে*।[১৬] *বেণীসংহারে* রৌদ্ররসের বেশ প্রাধান্য আছে এবং তার ফলে করুণরসের অভাব নেই। দ্বিতীয় অংকের শেষ অংশে দুঃশলা ও জয়দ্রথ-মাতার প্রবেশের পর কারুণ্যের স্পর্শ আছে। তৃতীয় অংকে দ্রোণাচার্যের মৃত্যু সংবাদে অশ্বত্থমার বিলাপও করুণের উদাহরণ বলা যেতে পারে। তবে এ দু'টি ক্ষেত্রেই করুণের স্থিতি স্বল্পকালীন। চতুর্থ অংকে দুঃশাসনের নিধনবার্তায় দুর্যোধনের রোদন-মূর্চ্ছাও সেই প্রকার ক্ষণিক করুণরসের বিকাশ। এই অংকেই কর্ণপুত্র বৃষসেনের মৃত্যুসংবাদ এবং দুর্যোধনের নিকট ভগ্নমনোরথ কর্ণের পত্র— এ দু'টি ঘটনা দুর্যোধনের কারুণ্যকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। নেপথ্যস্থিত কর্ণের নির্বেদও এই স্থলে করুণরসের বিকাশে সহায়ক। পঞ্চম অংকে গান্ধারী-ধৃতরাষ্ট্রের বাৎসল্যমিশ্রিত করুণ আকুতিও সুন্দর করুণ পরিবেশ রচনা করেছে। এভাবে ষষ্ঠ অংকে চার্বাকের মুখে ভীমের নিধন, অর্জুনের

সঙ্গে দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন প্রভৃতি সংবাদ শুনে যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী প্রভৃতির বিলাপ এবং মৃত্যুবরণের প্রচেষ্টাও করুণরসকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। এক কথায়, নাট্যকার ভট্টনারায়ণ তাঁর *বেণীসংহারে* বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সার্থকভাবে করুণরসের অবতারণা করেছেন।

বীর ও রৌদ্র রস প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যে বর্তমান নিবন্ধের বহু ক্ষেত্রে *বেণীসংহার*-কে বীর-রৌদ্র প্রধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একটি রস হবে প্রধান এবং এইটাই সাধারণ বিধি। এই প্রধান রসটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে অঙ্গীরস। *নাট্যশাস্ত্রে* কিন্তু এরকম কোন নির্দেশ কোথাও নেই। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সংস্কৃত-পণ্ডিত অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতে যতদূর জানা যায় তাতে কালের দিক থেকে মাতৃ গুপ্তই সর্বপ্রথম নাটকের লক্ষণে বলেছেন যে, শৃঙ্গার ও বীরের যে কোন একটি হবে নাটকের প্রধান রস অর্থাৎ অঙ্গীরস। প্রখ্যাত টীকাকার রাঘবভট্ট *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম*-এর টীকা *অর্থদ্যোতনিকা*-য় মাতৃগুপ্তের মত বলে নাটকের যে লক্ষণটি উদ্ধৃত করেছেন সেখানেই আছে ঐ উক্তিটি। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে পরবর্তীকালের নাট্যতত্ত্বের লেখকগণ নাটকের রস সম্পর্কে উক্ত মতটিই মেনে নিয়েছেন।[১৭] প্রাচীন নাট্যসাহিত্যের যে লুপ্তাবশিষ্টাংশ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তার মাঝে নাটকের ক্ষেত্রে সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই যে, হয় বীর অথবা শৃঙ্গারই অঙ্গীরস। *বেণীসংহার* নাটকে শৃঙ্গারের ভূমিকা কতটুকু তা দেখান হয়েছে, তাকে কিছুতেই অঙ্গীরস বলা যায় না। তাহলে এই নাটকে কি বীরই অঙ্গীরস এবং তাই যদি হয় তাহলে রৌদ্রের ভূমিকা কতটুকু? প্রশ্নটির উত্তর একটু ভেবে দেখার মত। এ দু'টি রসের স্বরূপ তাহলে পূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

নাট্যশাস্ত্রে রৌদ্র রসের বিবরণে বলা হয় যে, ক্রোধ রৌদ্রের স্থায়ীভাব, রাক্ষস, দানব ও উদ্ধত স্বভাবের মনুষ্য এর আশ্রয় বা বিভাব। যুদ্ধই এই রসের প্রধান হেতু। ফলে ক্রোধপ্রকাশ, ধর্ষণ, তিরস্কার, পাটন, ভেদন প্রভৃতির বর্ণনা বা অভিনয়ের অবকাশ রৌদ্র-রসোদ্বোধের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এই রসের অভি-নয়ে চোখ-রাঙান, ভ্রূকুটী ও দন্তে ওষ্ঠপীড়ন প্রভৃতি ত থাকবেই। শাস্ত্রকার নিজেই বলেছেন যে, রাক্ষস-দানবের স্বভাবই রৌদ্র, তাই রৌদ্র রস তাদেরই এই কথা বলা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের দ্বারা রৌদ্রের প্রকাশ হয় না। মানুষের দ্বারাও হতে পারে।[১৮] অভিনবগুপ্ত এই প্রসঙ্গে *বেণীসংহার*-এর ভীমকর্তৃক দুঃশা-সনের রক্তপানের কথা তুলে বলেছেন যে, ঐ কর্মটি ভীম করেছিলেন তার কারণ হচ্ছে তাঁর উদ্ধতস্বভাব, প্রতিজ্ঞাপূরণ এবং তখন তিনি ছিলেন রাক্ষসাধিষ্ঠিত।[১৯]

বীর রস উত্তমপ্রকৃতির, উৎসাহ তার স্থায়ীভাব। বিনয়, প্রতাপ, বল, বিক্রম, শক্তি প্রভৃতি এই রসের বিভাব। স্থৈর্য, ধৈর্য, শৌর্য, ত্যাগ, বৈশারদ্য প্রভৃতি প্রকাশের মাধ্যমে হবে বীর রসের অভিনয়। ধৃতি, মতি, গর্ব, আবেগ, উগ্রতা, অমর্ষ, স্মৃতি, রোমাঞ্চ প্রভৃতি এর ব্যভিচারী ভাব।[২০] বীর রস যুদ্ধবীর, দানবীর প্রভৃতি ভেদে নানা প্রকার হতে পারে *বেণীসংহারে* যুদ্ধবীরের প্রসঙ্গই মুখ্য। অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে, রৌদ্রের ন্যায় সংগ্রাম ও সংপ্রহারের যোগ থাকার ফলে জিঘাংসা যুদ্ধবীরেও থাকে।[২১] জিঘাংসা থাকলে ক্রোধ থাকতেই হবে। শৌর্যের প্রকাশেও ক্রোধের অভিনয় অনেক ক্ষেত্রে এসে যায়। বীর রসের ব্যভিচারী ভাবগুলির মধ্যেও রয়েছে উগ্রতা, অমর্ষ ও গর্ব।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে রৌদ্র ও বীর রসের মাঝে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। অন্তত একে অন্যের সম্পূর্ণ বিরোধী নয়। এই দুটি রসের মূল পার্থক্য স্থায়ীভাবের। সাগরনন্দীর *নাটকলক্ষণরত্নকোশে* পার্থক্যটা আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তিনি আটটি রসকে মৃদু, দীপ্ত ও মধ্যম এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে রৌদ্রকে রেখেছেন দীপ্তের এবং বীরকে মধ্যমের কোঠায়। এই মতে রৌদ্ররসের বৃত্তি হল আরভটী এবং রীতি পাঞ্চালী।[২২] গোটা *বেণীসংহার নাটকে* রৌদ্ররসের প্রকাশ যে মাত্রায় অধিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ভীমকে যদি নায়ক ধরা হয় তাহলে *বেণীসংহারে* রৌদ্ররসই মুখ্য বলতে হয়। ভীম ধীরোদ্ধত স্বভাবের নায়ক। অবশ্য বিনয় সৌজন্যাদি যে এই চরিত্রে নেই তা বলা চলে না। তবে সেগুলি কোথাও প্রধান হয়ে ওঠেনি। চরিত্র নাটকে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে রৌদ্ররসের অভিনয়ই অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে। তাহলে কি বলব যে, *বেণীসংহার নাটকে* রৌদ্ররসই অঙ্গী? একথা স্বীকার করলে এটাও স্বীকার করতে হয় যে, ভট্টনারায়ণ শাস্ত্রবচন মানেন নি। অবশ্য সেটা যে শাস্ত্রবচন নয়, মাতৃগুপ্তের বচন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। শাস্ত্রবচন সমর্থন করতে হলে বলতে হয় যে, ভীমের সকল কর্মের পেছনে রয়েছে তার প্রতিজ্ঞা-পূরণের প্রচণ্ড উৎসাহ। গোটা নাটকেই বলা যেতে পারে পাণ্ডবপক্ষ কৌরবপক্ষকে পরাজিত করার জন্য প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছেন। এই উৎসাহের পেছনে রয়েছে দ্বিতীয় পক্ষের দ্বারা প্রথম পক্ষের অবমাননা ও নানা উৎপীড়ন এবং তারই ফলে প্রথম পক্ষের মুখ্য চরিত্র ভীমের মধ্যে নাট্যকার দেখিয়েছেন ভীষণ ক্রোধের প্রকাশ, যার ফলে রৌদ্র রসের অভিনয়াংশ নাটকে এত প্রাধান্য পেয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে নায়ক বলা চলে না ঠিকই। তবুও যদি এই চরিত্রটিকেই নায়ক ধরি তাহলে তার মাঝে প্রকাশ ঘটেছে কিছু করুণের এবং সামান্য বীরের, ষষ্ঠ অংকে যেখানে তিনি দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

চরিত্রটিকে আমরা মঞ্চে শুধু এই অংকেই পাই। সুতরাং এই চরিত্রটি ধরে নাটকের অঙ্গীরস কি তা নির্ধারণ করা চলে না। উপসংহারে বলা যায় যে, ভট্টনারায়ণ বীর বা শৃঙ্গার একটি রসকে অঙ্গী করতে হবে নাটকে এই অনুশাসন হয় মানেন নি অথবা জানতেন না। কারণ কালের দিকে থেকে মাতৃগুপ্ত ও ভট্টনারায়ণের ব্যবধান বিশেষ নেই। [২৩] উভয়েরই কাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। ওটা অবশ্য স্বীকার্য যে মাতৃগুপ্ত কোন প্রাচীন মত নিজের মত করে বলেছেন। কথাটা ঘুরিয়েও বলা যায়। যদি ধরা যায় যে, পাণ্ডবপক্ষের বিশেষ করে ভীমের সমস্ত প্রচেষ্টার প্রেরণা এসেছে প্রতিজ্ঞাপূরণ এবং যুদ্ধজয়ের প্রবল উৎসাহ থেকে। তাহলে নাটকে বীরকে অঙ্গী ধরে রৌদ্রকে তার সহকারী রস বলতে হয়। তবে সাধারণ দর্শক-পাঠকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বিপরীতভাবে বলতে হয়, *বেণীসংহারে* রৌদ্র অঙ্গীরস এবং বীর তার সহকারী। এক কথায় এই দুটি রসেরই সমান না হলেও প্রাধান্য *বেণীসংহারে*। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে রৌদ্রের আধিক্যই মনে আসে :

গোটা আলোচনা থেকে দেখা গেল যে, ভট্টনারায়ণ *বেণীসংহারে* নানা রসের সমাহার ঘটিয়েছেন। প্রাধান্য যে রসেরই থাকুক, আটটা রসেরই যে অবকাশ অল্পবিস্তর আছে এখানে তা দেখান হয়েছে। শান্তরসকে মানলে এখানে তার স্পর্শও পাওয়া যায়। প্রথম অংকে কঞ্চুকীর নিকট দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করতে চেষ্টা করেছিলেন শুনে ভীমের যে উক্তি (পৃ. ২৭ : *আত্মারামা বিহিতরতয়ঃ ··· বেত্তি দেবং পুরাণম্* তাতে এবং ষষ্ঠ অংকের শেষ দৃশ্যে শান্তরসের স্পর্শ আছে বলেই মেনে নেওয়া যায়। অবশ্য নাটকের শেষ অংশে অর্থাৎ ভরতবাক্যের পূর্বে অদ্ভুতরসই প্রাধান্য পেয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ *নাট্যশাস্ত্র*, ৬/৩১, ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থ প্রবর্ততে।
নাট্যশাস্ত্র, ১৯./১, ইতিবৃত্তং হি নাট্যস্য শরীরং পরিকীর্তিতম্।

২ *অভিনবভারতী*, তৃতীয় খণ্ড পৃ. ১ ইতিবৃত্তশব্দবাচ্যংতদ্বস্তু শরীরং রসাঃ পুনরাত্মা

৩ *ধ্বন্যালোক*, পৃ. ৪০

৪ *নাট্যশাস্ত্র*, ৬/১৫, ১৭

৫ *নাট্যশাস্ত্র*, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়, রসসমীক্ষা পৃ. ১৭-১৪০

৬ *নাট্যশাস্ত্র*, ২০/ ১২, নৃপতীনাং যচ্চরিতং নানারসভাবচেষ্টিতৈর্বহুধা।
সুখদুঃখোৎপত্তিকৃতং ভবতি হি তন্নাটকং নাম।।

৭ *নাট্যশাস্ত্র*, ২০/ ৭ জ্ঞেয়ং প্রকরণং চৈব তথা নাটকমেব চ।
সর্ববৃত্তিবিনিষ্পন্নং নানাবস্থাসমাশ্রয়ম্।।

৮ *অভিনবভারতী*, ২য় খণ্ড পৃ. ৪১০।

৯ *ধ্বন্যালোক*, পৃ. ৩৯৮ ও ৩৯৯ *ধ্বন্যালোক*, লোচন, পৃ. ৩৯৯

১০ *নাট্যদর্পণ*, পৃ. ১৫৪

১১ *নাট্যশাস্ত্র*, ৬/৩৯
অভিনবভারতী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫, তেষাং রসানামুৎপত্তৌ সূচকাশ্চত্বারঃ।

১২ *নাট্যশাস্ত্র*, ৬/৫০

১৩ *নাট্যশাস্ত্র*, ৬/৭৩

১৪ *নাট্যশাস্ত্র*, ৬/৬৯

১৫ *অভিনবভারতী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬, ভয়ং তাবৎ স্ত্রীনীচবালা দিষু বক্ষতে।

১৬ *নাট্যশাস্ত্র*, ৬/৬২

১৭ *Our Heritage*, 150th Anniversary volume Matrgupta; A forgotten Author on Indian Dramaturgy, P. 194.
অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (অর্থদ্যোতনিকা সহ) পৃ. ৫, শৃঙ্গারবীরান্যতর-প্রধানরসসংশ্রয়ম্।

১৮ *নাট্যশাস্ত্র*, ৬/৬৩

১৯ *অভিনবভারতী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯-২০

২০ *নাট্যশাস্ত্র*, ৬/৬৬ এর পর (পৃ. ৩২৪)

২১ *অভিনবভারতী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪

২২ *নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, পৃ. ২২১

২৩ ১৭ নং টীকায় উল্লিখিত প্রবন্ধ অনুযায়ী মাতৃগুপ্তের কাল আনুমানিক খ্রী. সপ্তম শতাব্দী। ভট্টনারায়ণেরও কাল আনুমানিক খ্রী. সপ্তম শতাব্দী।